পুষ্পপটে ব্রাত্য মিনতি

মুক্তি মন্ডল

জোনাকরোড
শব্দশস্যের জেব্রাক্রসিং
ঢাকা

প্রকাশকালঃ বই মেলা ২০০৯

রচনাকালঃ জানুয়ারি ২০০৮ - জানুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদঃ রাজীব রায়

কম্পোজ
কালজয়ী কম্পিউটার্স
৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা।

ব্যবস্থাপনা: হাইলিংক, আদাবর, ঢাকা ১২০৭।

মূল্যঃ ৪০ টাকা

উৎসর্গঃ

পুষ্পরেণুতে পোকার যে পরিভ্রমণ, যে উচ্ছ্বলতা
তার অন্তর্গত সলকে ব্রাত্য মিনতি, মুখোশ সরিয়ে
দেখার আয়না ভেঙে নিজেকেই—টুকরো টুকরো
দেখা, আর জোড়া লাগানোর চেষ্টা।
- -

বাবা- মা,
উৎপল আর নীলাকে
এদের সব'চে বেশি ক'রে ঠকাই।

সূচিঃ

১. সহজ মানুষের হাটে
২. কাঁকড়াদের বন
৩. চিরায়ত ফুলের রেণু
৪. মধু ও বিষে
৫. যাত্রাকালের নোট
৬. রোদ্দুর
৭. ভ্রমণ
৮. তুমি রুমালের হলুদ আকাশ
৯. পিছন দিকের আলো
১০. নাচের স্কুল
১১. আয়না সুন্দর ও নীলছুরি
১২. বাঁকা চাহনির ঘড়াভর্তি জল
১৩. কামার্ত তাঁবুর মধ্যে
১৪. এই দেহ ও ওই ঘড়িবাজ
১৫. আমি তারকাঁটায় দেখছি
১৬. দৃশ্যবাদী কাঠুরে
১৭. কালো ঘোড়া
১৮. নিশিযাপনের লিপিগুচ্ছ
১৯. নটরাজ
২০. দ্বিধা
২১. ভেজা কাঠের স্পন্দিত গন্ধ
২২. সিন্দুক
২৩. পথভোলা
২৪. রান্নার প্রস্তুতি
২৫. গুপ্তচর
২৬. ক্যামেরা
২৭. আলো সম্ভাবনা
২৮. শাপগ্রস্ত বেণীর আকাশে
২৯. প্রতিটি ভোরের সূর্যে
৩০. এখন যেমন
৩১. ক্যালেন্ডার
৩২. ধূপ

প্রকাশিত গ্রন্থ

ঘড়ির কাঁটায় ম্যাটিনি শো (কৌরব, কলকাতা, ২০০৮)

সহজ মানুষের হাটে

যে সব মানুষেরা এলাকা ছেড়ে কোথাও যায় নি
তারা যৎসামান্য আনন্দলোক দেখে জীবনের ক্ষুদ্র ভাঁড়ারে
অপ্রকাশিতই রয়ে যায় দেহখড়ের নিমগ্ন বেড়াঘর
চৌকির পাশে অবহেলায় পড়ে থাকে তাদের পানের বাটা।

গুটানো শীতল পাটির ভূপৃষ্ঠে
এইসব ক্ষুদ্র মানুষেরা মাটি লেগে থাকা ঘ্রাণ মুঠো করে
ঘুমায়, আবার জাগে।

আর নৈসর্গিক কাঁটায় যারা দাসানুদাস, তাদের হৃদয়
চমকিত হয় বিজলিতে, বৃষ্টি শেষে এরা ঘর থেকে বের হয়
দিগন্তের প্রলোভনে এরা সংসারের মায়া ত্যাগ করে
ছড়িয়ে পড়ে সহজ মানুষের হাটে।

এদের ভেতর প্রতারণা বলে কিছু নেই, এরা আওলানো
জীবনের খানা-খন্দে পরিভ্রমণে বের হয়
পুঁথিগ্রন্থের ময়লা ছেঁড়া পাতার কোণে এদের সংরাগ, বাসনা
মনোরীতির জঙ্গল হিসেবে স্থিতি পেয়েছে।

এরা কোনও সংহত শৃঙ্খলে আটকে থাকতে চায় না
দীপ্তির ভাষা তাদের চোখে-মুখে সমুদ্রস্নান।

কাঁকড়াদের বন

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার রাত্রিতে বাহুভেদী স্পর্শ
লতিয়ে ওঠে দেহের সিঁড়ি বেয়ে।
আমরা দেখিনা, অনুরাগে জন্ম নিচ্ছে শীত,
ঝিঁঝিঁ পোকা।

শীত উপভোগে উন্মূল হয়ে ওঠা খেরোখাতার
পৃষ্ঠা জুড়ে ঝাউবন, শামুকের খুলি
আর মাতাল সমুদ্র একসাথে ভেসে ওঠে।
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে ওঠে ঝোপ
আর শাদাসিধে জঙ্গলে।

শেষ পাতায় হলুদ খামে
দেখি আমাদের মনে গুটিবসন্ত, বালুর থেকে
কাঁকড়ার থেকে, আমরা খুব বেশি দূরে না
অনেকটা কাছাকাছি।

যে পথের শেষ নেই যে পথ অনন্ত কুয়াশায়
আনন্দ ধ্বনির পেট চিরে উগরে দেই সুনীল
সারল্য ও তার মুঠোর মধ্যে গড়ে তোলে যেসব পক্ষীকুল
সুশ্রী ঝলকের ডানা,

সে পথে যারা হেঁটে যায়, তাদের উন্মুক্ত দৃষ্টির
দিকে তাকালে—মনে হয় সুবৃহৎ আকাশের তলে
তুমিও বালুভূমি, কাঁকড়াদের বন।

চিরায়ত ফুলের রেণু

আমি কোন রাক্ষসের রাজ্যে যাই নাই
চিরায়ত ফুলের রেণুতে যারা প্রত্যহ ভ্রমণে যায়
তাদের অপার্থিব বাসনা, আকাঙ্ক্ষায় আমি
দেখি রাক্ষসপুরীর দেওয়ালে টুকরা হওয়া মানুষের দেহ
দ্বিখণ্ডিত পশুপালকেরা ওখানে অর্ধ চিন্তার তারে
দেখে নিজেদেরই জিভের ওপোর সারি সারি পিঁপড়ে
পতঙ্গদের সুরাপান, বৈভব।

বিমর্ষতার বৈধ সন্তানেরা ভাষার বাইরে শিকারে গিয়ে
ফিরে আসে নিজেদের নদীলগ্ন ঘ্রাণে,
অবসর যাপনে ক্ষুব্ধ ঘড়ি সারাইয়ের বংশজাত
বণিকেরা দরজি ঘরে বসেই লাটাই ঘুরাচ্ছে।

কাঠ চেরাইকারী শ্রমিকেরা ও রুমাল নির্মাতাদের
ঘনিষ্ঠ চোখাচোখির অরণ্যে আমি ভ্রমণে গেছি,
পার্থিবতার তোড়ার ভেতর দেখেছি মাছি, ব্রণভরা মুখে
ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা অসুস্থ্য মৎস্যজীবী।

তরকারী আলার বাঁকের পাশে শুয়ে থাকা
ফিকে রোদে আমি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখেছি
রেণুতে যারা ভ্রমণে যায়, তাদের আকাক্সক্ষা ও বাসনা
রাক্ষসী লোভের স্তূপ, বাজারি হট্টগোলে তাদের নখে,
চোখে-মুখে ভেসে ওঠে ভাগাড়ের অসংখ্য শেয়াল।

আমি চুপচাপ দেখি চিরুনীর কোণে লেগে থাকা
আওলানো কালো চুল, বাদাম বিক্রেতার সজল চোখ বেয়ে
নেমে যাওয়া বর্ষণমুখর রাতের ধ্বনি,
সহাস্য নদীতে ভেসে আসা বৃক্ষের ভেজা শরীর,
তরমুজ ক্ষেতের ফড়িঙ।

বক্ষদীর্ণ ডালিমেরা আমার নিকটে আসে
ঘেয়ো আপেলেরা আমাকে দেখেই
মনে করে হরিণ কিশোরীর খোঁজ হয়তো আমিই জানি।

মধু ও বিষে

কত লোকই তো রোদ পেষা স্বপ্নের ঘোরে
এমনিতে এদিক সেদিক বের হয়ে পড়ে
কোন প্রকার যাতনা থেকে নয়, কোন আকর্ষণে নয়
নিজের কাছে কী যেন নাই
এই তাড়না থেকে রেহাই পেতে, তারা বের হয়।
মনকে পীড়ন না দিয়ে নির্মল হাওয়ায়
তাদের যাত্রাধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে, এদিকে ওদিকে।

দয়াদাক্ষিণ্যে আস্থা রেখে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো
এইসব মানুষেরা কাঁদে একলা একলা, গোপনেই চোখ মুছে
নেয় লাল গামছায়, আবারও ওই কী রকম এক
তাড়নার ফাঁদে পড়ে—
শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ায়, আবার হাঁটে।

এরা ভৃত্যস্বভাবের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে
মনোবিচয়নে এক গ্রাম থেকে অন্য আর এক গ্রামে
থামে, একটু জিরিয়ে নেয়, ন্যূনতম
সুখানুভূতিও চাই না, তারা মনোজমিনে সুড়ঙ্গ কেটে
শুধু দেখে পুষ্পপ্রাণ, মানুষ, কীটপতঙ্গে খুঁজে বেড়াই

প্রেম, ফেরে না গৃহে।

মধু ও বিষে ভরা জগত সংসারে তারা ভাবুক
পথের প্রতিক্ষণটুকু ধরে রাখে
নিরাভরণ মানুষের সকল ভাষা ও ধ্বনিতে।

যাত্রাকালের নোট

আমিও যাবো বলেছি তাঁর আয়নার পাশে
জেগে থাকা প্রসূন তাঁবুতে।
আরো সব জাগন্ত বর্ণাভার তীরে কুড়িয়ে নেবো
সগোত্র মৌগন্ধী স্নেহশীল হাড়ের বাঁশরি।

গুহাপটে আঁকা পরিভ্রমণ বৃত্তান্তে যেই সমস্ত মুখেরা
গ্রীবাভঙ্গির রাজ্যে পরিবৃত অবসাদ ও নীলজ্বরে
তাদের হৃদকূপের পাশে আমিও যাবো।

সঙ্গে নেবো বাজুতে গ্রন্থিত মেঘদল
সুরাপাত্র ও কাজুবাদাম।

পুষ্পরথে উন্মূল মধুপের দল আয়নান্তরে
যে সকল হরিণশাবকের উরুতে জাগে
আমি তাদের হর্ষস্নানের দৃশ্যে সুদীর্ঘ রাত্রির
নিষ্পলক সুহাসিনী চন্দনে—
একাকী জাগবো।

গ্রীষ্মাবকাশে বর্শার কামনা ও ওষ্ঠতে তন্দ্রাহীন
বৃক্ষদের দেহ সৌষ্ঠবে ও কুয়াশাচ্ছন্ন পথে,
টেনে নিয়ে যায় যেসকল টিলার বিষাদ, আমি
তাদের সবুজ ঢালে—
একলাই যাবো।

মৃৎপাত্রের পাশে
পড়ে থাকবে আয়না ও জহরের শিশি।

রোদ্দুর

(১)
গমন পথের চারপাশ জেগে উঠছে প্রস্ফুটিত আঁধার
কড়ির শাদা চোখে বসন্ত সরিয়ে
নীল কামরায় ঢুকে পড়ছে শীতের দহন, নীল টেলিগ্রাম।
জানালার কাচে লুপ্ত ভোর স্নান

শরীরের সবকটা কপাট খুলে উড়িয়ে দিচ্ছে
তিলোত্তমা উৎফুল্ল গাল। আমি মাথা
নুয়ে থাকি, স্নায়ুর গভীরে
তোমার গ্রীবার উপর আঙুলের জলছাপ তলিয়ে গেছে
আমি টের পাই নাই।
ঝরাপাতারা মৌফুলের গন্ধে খুলে দিয়েছে
সুবর্ণ স্কার্টের কিশোরী মুখরতা
গতির তীক্ষè দ্বার, আমি এর পাশে জেগে থাকি।
লুটানো হরষে বিমোহিত নিপশাখে সূর্যমুখী
ছুড়ে দিচ্ছে প্রণয়ের গোপন উচ্ছলতা
দ্বিধান্বিত মুখের বিদ্যুতে আমি ভাগ হয়ে গেছি
সুষমার চুমকি তারায়।
কোমলতার শরীর চু'য়ে
ঝরে পড়ছে নিঝুম রাত, চুড়ির শব্দে ভরে উঠছে ঘর
নৌকোর ভেতর লুট হয়ে যাচ্ছে বিহ্বলতা।
আমি পালের রশিগুলি একে একে
উড়িয়ে দিই, জাগরণের জানালা বেয়ে নামতে থাকে
রোদ্দুর, কপটতার মুখোশী বেড়াল।

(২)
প্রত্যহ ধুলোর রেখা মুছে দিয়ে পাথরের বুকে
ছিটিয়ে দিই পানির ফোটা।
দুধ ঢেলে দিই,
চেতনায় রৌদ্রের উষ্ণতা ফেটে উৎসারিত হয়
অসুখের নীলিমা, নির্জন পোকা।
কার বেণীতে আলো এসে প'ড়ে নিশীতে?
চুরমার হয়ে যায় লালক্ষুধা, কাচের গ্লাস
ও সিঁড়ি।
আমি কি চিনিনা তাকে?
লণ্ঠনের আলো থেকে তোমার মুখের সন্ধ্যেবেলা
জ্বলে ওঠে, পুরনো পাহাড়ে ফিরে যায়
সূর্যের প্রকৃত তাপ।
পিছন দিকের জানালায়, নৈঃশব্দ্যের তিলোত্তমা
নিঃসঙ্গের দাঁড়ে হাত রেখে, দেখি
গুড়ো গুড়ো হ'য়ে যাওয়া ফুলের পাপড়ি,
খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।
আমি তাঁর কণ্ঠে
একূলে ওকূলে সুর হতে চাই।

ভ্রমণ

অস্পষ্ট তিলের দিকে যতবার গেছি

আকাশের দিকে উড়ে গেছে ডানা মেলে পাখিদের ঝাঁক
প্রগাঢ় সম্পর্কের সেতু ভেঙে প'ড়েছে
রুমালের কোনা থেকে,
নদীর কাছে গিয়েই ডুবে গেছে চাঁদ।

আয়নামহলে চুড়ি-হাসির পায়রাগুলো উড়ে উড়ে
কোথাও বসেনি, গাছেদের কাছে
এগিয়ে এসেছে দূরের কেউ,
তাকে কেউই চেনে নাই, হরেকরকম ঝুমঝুমির ভেতর
হারিয়ে গেছে যেসব ডালে বসা সবুজ দাগের
চিহ্ন, তাদের বুকের পাশে শুকনো নদীদের মেলা বসেছে।

ঘর ছেড়ে পালিয়ে ইচ্ছের বংশীবাদকের সাথে
কাঁধ বিনিময় ক'রে তোমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি।
তাঁর যাদুকরী সুখ-দুঃখের ঝোলাই তোমার গোপনে
খোঁপাবাঁধারদৃশ্যগুলো লুকিয়ে রেখেছি।

পথের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখের সড়ক থেকে
উপড়িয়ে রেখেছি মাইলপোস্টের ছায়া,
নাইটকোচভর্তি মালিনীদের লাল টিপেরা ছেড়ে গেছে
বাসস্টপেজ, তাদের মলিন মুখে তোমার হাসি
দেখে আমি আর কোথাও যাই নি।

সিকেয়ঝোলানো নিঃশব্দের সুগন্ধী স্পর্শরা আমাকে চেনে নি
বাসনার পিঠে মালমাল উঠিয়ে নাও ছেড়ে দিয়েছে
বিরহপাড়ার বণিকেরা, তাদের বন্দর ছেড়ে যাওয়া দৃশ্যের দিকে
তাকিয়ে থেকে ভেবেছি—এবার গভীর গাঙে ছেড়ে দে'বো
শ্লোকের বিষণœ ভেলা।

জলের শব্দে আকাশের হাতছানিতে আর বাড়িতে ফিরবো না

তুমি রুমালের হলুদ আকাশ

সবুজ রাতে আমার ঘুম আসে না, মাথার পাশে
কালো পাহাড় জাগিয়ে রাখে সাপ

মাটিতে বুকের চিনচিন

কেউ জানে না কাল আমার পা খু'লে নিয়ে গেছে
ডাকিনীপাড়ার মেয়েরা

ওদের কাছে আমার ফুলগুলি শুকিয়ে শুকিয়ে

এখন মচমচে, তাদের রিমঝিম ঠোঁট

আমি দেখছি পালের উপর তোমার চুল

হাতের ভেতর জগতের সব আরাধনা
তারা ফুল হয়ে ওঠে

তারা কাঠের গায়ে পাখির পালক হয়ে ওড়ে

আমি পাপড়ির মধ্যে সুরের নীরব ডুবুরি
আলগা করে দেখি
তুমি রুমালের হলুদ আকাশ

পিছন দিকের আলো

(১)
আমি তাকে দেখি নাই, তার উপস্থিতি টের পাই
সে যখন আমার পিছনে এসে একাকী দাঁড়ায়
আমার সামনে সারি সারি ফুলক্ষেতে ভরে ওঠে
আমি ফুলক্ষেতে দেখি যোগিনীরা চুল খুলে দিয়ে
ফুল তোলে, পাখিদের টহলে ভরে যায় আকাশ
দূরের দিগন্তে ভেসে ওঠে তার কোকিল আকার।
আমি কোকিলের চোখে রাত-ভোর সুুরমা লাগাই
পালকের গায়ে স্পর্শ ছড়িয়ে দেহের কানাগলি,
ফুটপাতে বিছিয়ে দিই তৃষ্ণার গাল, লোভাতুর চোখ
বাস, ট্রাক, সেনাবাহিনীর গাড়ি এরা সব একে একে
ঢুকে পড়ে ড্রেনে, আমি দেখি, আর একা হাসি
আমার হাসির বস্তিতে রাজা সাজে আমার হাত।
ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আমি রাজভবনের দিকে
যেতে থাকলে আকাশ থেকে পাখিরা ফুল ছিটায়. . .
অন্ধকার গুহাঘরে মিশে থাকা তোমার দেহের
কোষে বনপরীদের নৃত্যে, হাতের ভেতর হাত
গজিয়ে ওঠে, ঠোঁটের ভেতর গজিয়ে ওঠে তীরের
ফলা, দৃষ্টিতে বৃষ্টির শব্দ ফুটিয়ে তোলে পাহাড়।
চুল হয়ে ওঠে বাতাসের প্রাণ—মনোকূপে তার
জানালার রড থেকে অনেক হাতের দীর্ঘ লাইন
এক-কাতারে মাটিতে গিয়ে মেশে—তার আগমন
আমি টের পাই, সে আমার পিছন দিকের আলো।

(২)
ওই দিকে চোখ জুঁইফুলে ঝুলে রয়, আঙুলের ডগা
বেয়ে নেমে পড়ে নিঃশব্দের কালো পাহাড়ের ছায়া

আমাদের জীবনের মোড়ে মোড়ে গড়ে ওঠে ভাষা
ও ভাষাহীনতার দোকানঘর, এইখানে আমাদের
প্রেম প্যাকেটে প্যাকেটে থরে থরে দোকানের হর্ষ
হয়ে ওঠে, আমরা সেই হর্ষের বিজ্ঞাপনে দেখি নখে
পালিশ করছে এক উকুন ব্যবসায়ী আর তার জিভের
উপর অসংখ্য কালো পিঁপড়েরা লাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছে।
ওদের ভেতর ঘটিবাটি বিক্রি করে যারা সর্বহারা হয়ে
শহরে এসেছিল, তারাও দেখি ফেরি করছে কাজুবাদাম।
হলুদের ক্রেতাগণ অরণ্যের দিকে যাচ্ছে আর আমি
তোমার হাতের মধ্যে সুঁইসুতো হয়ে আছি, সুখ-দুঃখ।
শহরে সমস্ত দোকানদার আমাকে টিটকারী করে আর
আমি তাদের হৃদয় নিয়ে প্রতিদিন পথে পথে ঘুরি।

নাচের স্কুল

ওইখানে নদীর শুকানো দাগ, কালোসংহার, মায়াসূচি খুলে একটা গাছের নিচে সবুজ সংরাগ
জড়িয়ে আছে, যার ভেতর তুঁতশিল্পের পোকাদের বেদনাসমূহ নীলজরি
তারা শিরার ভেতর কাল রাতে অনেক পাখি উড়িয়েছিল,
তাদের চোখের মৌচাকে মেঘলা আকাশ।
নেচে নেচে আজআমার শরীর খুঁড়ছে, পাখি বিক্রেতার মুখে মিলিয়ে যাচ্ছে ঝুমঝুম বৃষ্টির শব্দ,
তারে জাগিও না।

হাতের মধ্যে দেখো বাঁশিওয়ালার ধড়, কালী মন্দিরের পাশে ঘুমানো পাগল দেখো মিটিমিটি
আকাশের তারা, তাকে জাগাও, তার
চুলের বাগানে খুন হয়ে যাওয়া শেফালী ফুলের মালায় আজরোদ উঠেছে।

নদীহীন মুখের মানুষেরাও দেখো যেচে যেচে নাচের স্কুলে এসেছে, ওদেরকে তুমি নাচ শেখাও,
আমি এখন ঘুমাতে যাবো বংশীবাদকের চোখে,
আমাকে কেউ ডেকো না।

আয়না সুন্দর ও নীলছুরি

১.
আয়নায় যেই মুখ নীলছুরি তার নাভি লাল
প্রতিদিন তার তীরে দাঁড়ের শব্দে নিবিড় দৃষ্টি
লুফে নেয় বাহুডোর, সন্ধ্যা নামে ঠোঁটের কিনারে।

২.
মাঝিদের বাহুলগ্ন রোদমাখা দিন শেষে একা
একটা বেড়াল দেখি ঘরের মেঝেতে, বিছানায়
আঁচড় কাটে নিশিতে, নির্জনে তাকে আদর করি।
তার নখের আঁচড়ে আমার দেহের সবক'টা

জানালায় সূর্য ওঠে, আলোর পেরেকে ঝুলে থাকে
অসংখ্য পালক, সুর। শিহরণে কাঁটা গেঁথে রাখি
ভোরের স্নানে, পাখিরা উড়ে যায় আপেলের বনে
উতলা বাতাসে যেই হাত রাখি বৃক্ষদের ডালে
সবুজের দাগ লেগে সেই হাত পাতা হয়ে যায়,
কথা বলে ওঠে মেঘ, সুদূরের এক আওয়াজ
আমাকে জাগিয়ে রাখে তোমার খোঁপার অভ্যন্তরে,
আমি জাগি, নৈশলিপি লিখে একা আকাশে উড়াই।

৩.
একলা হলেই তুমি, যে আকাশে ওড়ে নৈশলিপি,
তার জ্বরতপ্ত দেহে একা খোঁজ শাদা মেঘমালা,
আমি খুঁজি ফুলগন্ধ, দিগন্তের নীলাভ সুন্দরী।
ঘাড়ের ওপোর চাঁদ নেমে আসে, জানালার কাচে
বসে থাকে ঘুমহীন মুখেদের বিষাদের ছবি
ক্যামেরা তাদের মুখ দেখে তুলে রাখে দেওয়ালে।
বর্ষা আসে, যায় তবু তার ঘ্রাণ লেগে থাকে মনে,
দেওয়ালে তার ছবি ফুটে ওঠে, তোমার কোমর
সেই ছবির শরীরে লেপটে থাকে, আমার স্নিগ্ধ
মাটির গন্ধ মনেতে উড়তে থাকে যার ঠিকানা
নাই কিনারাও নাই, নদী এসে ঘর ভরে তোলে,
ঢেউয়ে মাতাল হয়ে আমার পুরনো প্রেমিকেরা
সবুজের জামা পরে উঠে আসে নির্জন ডাঙায়।
৪.
ক্ষেতের আড়ালে মায়া পরীদের ভিড়, নীল নখে
আমার জমানো রোদ, তাদের পিঠের যবক্ষেতে,
হলদে বনে শিশির, আমার পা ভিজে ওঠে, হাতে
উড়ে এসে বসে টিয়ে, চোখের শহরে ভিড় করে
জোনাকিদের উল্লাস, এইসব আমি আয়নায়
দেখি, ছুরির গতরে জেগে ওঠে গ্রাম, বালুভূমি
রাখালদের গামছা, তবু ঘুম থেকে জেগে উঠে
দেখি সব ফাঁকা, মায়া। আমার শহর নাই মনে।
নতুন রাস্তার পাশে আমি খুলে রাখি দেহতুলি
অজানা মেঘলা এসে আমাকে ভিজিয়ে দিতে চায়।
ছুরির ধার খুবলে ঢুকতে চায় জামার চোখে,
আমি কিছুই বলি না মৌমাছিদের ঘরের কোণে
চুপ করে বসে থাকি, ভাবি, এ শহর আমার না
তোমার। তোমার নাক ফুলে আমি দীর্ণ আগন্তুক
আয়নার মধ্যে আমি খাই দাই ঘুমাই দৌড়াই।

৫.
গভীর রাতে তোমার ঘরে ঢুকি সেই আয়নায়

ফালি ফালি দেহখণ্ড হয় রাত্রে তোমার আহার।
তুমি আমাকেই চাও, আমাকে পেলে আরো রক্তিম
হয়ে ওঠে ওষ্ঠ, গাল। আমি তোমার আজ্ঞার পাত্র
দেওয়ালে সেঁটে রাখো, আলনায়ও, রাখো ঝুলিয়ে
পেটিকোটে, ব্লাউজের হুকে, রান্নাঘরে, বিছানায়।
আমি থাকি নির্জনতা ছুঁয়ে তোমারই অঙ্গে-অঙ্গে
বাহানার খিড়কিতে। পথের আড়ালে তুমি আমি
এক্স জগতের আর সব মায়া, ভ্রম। আমাদের
উরুর জগতে চাঁদ ওঠে প্রতিরাতে, প্রতিক্ষণে
আমরা শরীরে আলো ফেলে দেখি কামতীর্থনদী,
এই নদীর পাড়েই গড়ে তুলি আমাদের ঘর।

৬.
আমাদের ঘরে নাই জানালা দরোজা সবদিকে
খোলা আকাশের ছায়া। আপেলের বন থেকে দেখা
যায় আমাদের গৃহ, বাক্যহীন ঠোঁটে রোদভেজা
ঘ্রাণ লেগে থাকে, পাখি ওড়ে, ঝিঁঝিঁ ডাকে সারাক্ষণ
মননের তলে। লতা পাতা ঝোপঝাড় যেইখানে
আছে সেইখানে তুমি দেখি সবুজ পাতার ফাঁকে
একটুকরো রোদ্দুর। আমি এই রোদে মুখ ধুয়ে
তোমাকেই দেখি আর ভাবি, ডাবসানো পেয়ারার
দিকে তাকিয়ে যা দেখি, তা কি এই জীবনের যত
যন্ত্রণা যত মধুর স্মৃতি জমা হয়ে আছে চোখে
সেটা কি আমার? নাকি ভীত গ্রহের অচেনা কারো?

৭.
এই দ্বিধা এই ঘোর কলপাড়ের ম্লান দৃশ্যের
অবয়বে ফুটে ওঠে দেখার তৃষ্ণায় দৃষ্টি ডুবে
রয় বিভাজিত রোদে, ডানা নাই কেন?, চণ্ডালিনী
বাঁকা চোখে এইসব দেখে আর রিমঝিম হাসে।
ওই হাসি বুনোহাঁস, পুকুর পাড়ের অন্ধকারে
ও হাসির পানবাটা আমি খুলে দেখেছি ওখানে
পান বরজের রাত, সুপারি বাগানের হাওয়া
জড়াজড়ি করে থাকে। বুকের চিনচিন ব্যথার
সুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে
ঢেকে নেয়, গ্রাস করে, তুমি ছুরির বাটে আমার
মৃত্যুদৃশ্য দেখো, হাসো, বুনো হাঁসের পালকে মুখ
মুছে ঢুকে পড়ো ফের আয়নায়, ছুরিওষ্ঠধ্যানে।

৮.
নীলছুরি ও আয়না এইকালে তোমার আমার
সব তৃষ্ণা, ভাটফুল, নদীর দু'কূল, পরিবার

পরিজন, রাস্তাঘাট, সবকিছুকেই বশে রেখে
মাথায় হাত বুলিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে শরম জামা,
লোভের চাবুকে ঠোঁট রেখে যারা পান করে মধু—
তাদের মগজ গলে গেছে তুমি আমি এইসবে
নেই, আমরা গলুই এর কানে কানে কথা বলি,
বসন্ত-হেমন্ত শীত নিয়ে মুখ টিপে হাসি আর
আমাদের চোখদুটি খুলে রাখি মাটির ঘড়াই।
ধান উঠার মৌসুমে একে অপরের চোখে চোখ
রেখে আমরা নৌকায় আঙুলের সাথে ভব্যতার
এক নিবিড় অরণ্যে ঢুকে পড়ি, ওখানে ভাষার
বাইরে গিয়ে আমরা মাটিতে হৃৎপিণ্ড খুলে বসি।

৯.
মুখের দু'পাশে নদী, পাশে আমাদের নীল গ্রাম,
খেয়া ঘাট পার হ'লে দেখা যায় রূপ কুমারীর
হাট, বৃদ্ধবট গাছ, মন্দিরের ইটে শ্যাওলার
জট, তাকালে চোখের অসুখ সারে, মনের দুঃখ
মিলিয়ে যায় বাতাসে। এই হাটের পাশেই আমি
আর তুমি মিলেই হলুদ বন চশমার ক্ষেত দেখি।
নারীকুল নদীস্নানে এলে, আমরা চশমা ক্ষেতে
মাটির ঘ্রাণ আঙুলে তুলে নিয়ে ভাবি, সব পাখি
পাঁজরের শব্দে তারা উড়ে যায় আকাশের মেঘে।
দিন নয় রাত নয় ঘুমের অক্ষরে জেগে থেকে
যেসব কোকিল উড়ে গেছে ভাষাহীন কাঁটাকুঞ্জে,
তাদের বুকের মধ্যে একলাই উড়ে যাবো আমি।
তুমি আয়নার চোখে সেঁটে দিও স্নিগ্ধ মধুবন,
আমি নীলছুরি হয়ে টুকরো করবো দগ্ধ এই দেহ।

বাঁকা চাহনির ঘড়াভর্তি জল

বাঁকা পথের সবুজ নথে যে তৃষ্ণার মোড় ঘুরে
গেছে কাঁটাঝোপের রূপসী ঠোঁটে,
তার গভীর আড়ালে, আমি বক্ষ খুলে দেখি সুর
মাটির সরাতে দুধ
ফেটে, দু'ভাগ হয়ে গেছে শরের নদী।

একভাগে আমার লোভের মোহনায় ঢেউ ওঠে,
জলের কাঁপনে জন্মদাগে এসে
দাঁড়ায় বাহুর ছায়া।
অন্যভাগে, শীত ছাউনির করিডোরে চেয়ারের হাতলে
সমুদ্র ঘ্রাণে ভরে ওঠে—এই গন্ধ জাগিয়ে রাখে শরীর।

তোমার দেহের নৈশলিপি
উড়ে এসে ভরে তোলে ঘর, খুলে রাখি ঘরের জানালা।

উঠোনে গভীর মুগ্ধতার তুলশী গাছের কাছে
পড়ে থাকে নৈঃশব্দের ছাপ, বাঁকা চাহনির
ঘড়াভর্তি জল৷

কামার্ত তাঁবুর মধ্যে

আমি আসলে জানি না কামার্ত তাঁবুর মধ্যে নীল
জ্যোৎস্নায় কাদের মুখের ওপোর
নেচে গেছে রাখালেরা, ওদের পায়ের দাগ-চিহ্ন দেখে
কালরাতে জানালায় নিস্তব্ধতা চু'য়ে চু'য়ে পড়েছে।

আর আমি রেলভ্রমণে যাদের সঙ্গী হয়েছিলাম,
তারাও দেখি মেঝেতে নেচে গেছে,
তাদের পায়ের দাগ মেঝেতে পড়েনি। যে অরণ্যে
পথ হারিয়ে বাঁশির সুর মিশে গেছে
পাতাদের স্বরে।

হর্ষকামী পেরেক কালকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে
রেখেছিল স্লিপিং গাউন, যার আসার কথা ছিল সে আসে নাই,
তার ছায়া এসে বলে গেছে দরোজার কানে,
আজটিয়ে পাখিরা আকাশে নামবে না।

আসলে, আমি বৃষ্টির মধ্যে দু' ভাগ হয়ে আছি
একভাগে জেব্রাক্রসিং
এবং সমব্যথী বন্ধুদের মুখের উজ্জ্বলতা,
অন্যভাগে মাংশের ট্রাক, স্বাভাবিক পথচারীদের
উপড়ানো চোখ।

একভাগের লুকানো রোদে উড়ে যায় অন্যভাগের নদী
স্থির হয়ে থাকে জলপাই বন, স্নিগ্ধ রেললাইন।

এই দেহ ও ওই ঘড়িবাজ

সব কিছুতেই এই দেহ অন্ধ ওই রাতের নির্জন ঘড়িবাজ যার নৈঃশব্দ্যের ইন্দ্রজালে
কার পায়ের শব্দ উঠে আসছে
ঘাড় বেয়ে বেয়ে
বিধূরতার সীমানা ছকের বেলাভূমিতে বিচ্ছিন্নতার শাদাকাঁখে
নীল কলসি ভাসে, জলের ছায়া পড়ে চোখে।

আমরা কফি খাই, সিগারেট টানি, ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে দেখি রাস্তার পাশে ট্রাক;
সামরিক কামান তার উপরে ফিট করা, আমরা দেখতে থাকি তার দেহ,
নির্লিপ্ত চোখের তারা।
তার তো মন নাই, ঘুম নাই তবু আমরা দেখি বিমানের পাখা, ভাঙা
সমস্বরে গান গেয়ে ওঠে আধুনিক মানুষেরা, তাদের গলার ভেতর
থেকে উড়ে যায় পাখিরা, তাদের কালোঝুঁটিতে মেঘ
ঝুলে থাকে।

গোধূলি বেলার কাচে
গলিত ঘড়ির কাঁটা নাচে।

নাচুক, যারা চলে গেছে মায়াহরিণের বনে, তারা আর ফিরবে না, অন্য কোথাও
আমরা আলোকাঠের পেরেকে তাদের চোখাচোখির তেরচা
প্রক্ষেপণ দেখবো, তখন আমাদের জ্বলন্ত পাহাড়গুলো থেকে আগুনের
পাখিরা পুড়ে ছাই হবে, আমরা সেই ছাইয়ে জলের
দাগ খুঁজবো, হাতের ছাপ দেখার চেষ্টা করবো, ঠোঁটের গোপন অভিসার
যদি টের পাই, সেটা আমরা গুছিয়ে তু'লে নেবো কোঁচড়ে।

দেহের ডালে উড়বে পাখি
আমি খুঁজবো তোমার রাখি।

আঁখি খুঁজবো না ঝোপের ডালপালায় শরীরের কাঁপন মুছে যায়নি যাদের,
তাদের চোখে নদীতে স্নান দেখবো, ডুবে যাওয়া জাহাজের জায়গাটাকে বেঁধে
রাখবো ফ্রেমে, ওখানে আরো যাদের আঙুলেরা ছুঁতে
পারে নাই আকাশের রঙ, তাদের পিঠে তুলে দেবো গান।

গানে গানে নাও ভেসে যাবে
দূরের ময়না দ্বীপে।

আমরা একটু বেলাটাকে বাড়িয়ে রোদের আঁচড়কে খামচানিগুলোকে
ছড়িয়ে দেবো মানুষের মুখে, হাতের কবজিতে, এর ফলে পাখিরা হরিণেরা
জল খুঁজতে থাকবে, আমরা তাদের মুখে
জল দেবো, নিজেদের তৃষ্ণার দেওয়ালে গড়াতে থাকবে ভোর, ছটফট করবে
মানুষেরাও,
বৃক্ষের গভীরে ঠোঁট ডুবিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জন্য
জড়ো হবে জগতের সমস্ত আলো।
আমরা এই আলোর বাইরে এসে অনুভব করবো ঘোর। ভাষাহীন এক
মায়ার কষে আমাদের জিভ ভরে উঠবে, কেমন তেজি হয়ে উঠবে বাহুর দাঁড়,
আমরা ফের গান গেয়ে উঠবো।

ও কোকিল ও কোকিলা
আমারে ফেলে একলা, কই গ্যালা কই গ্যালা।

শেষে আমরা পথের ধারে বৃক্ষদের গ্রামে ঢুকে পড়বো, যেখানে সব কিছুতেই
লেপটানো থাকবে
নীল আলো, সব সময় নদীদের ঘুম হবে ভালো,
হা হা করতে করতে আমরা একবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চাইবো, বৃক্ষদের রাজ্যকর্ণধার
আমাদের আশ্রয় দেবার আশ্বাস দেবে নিশ্চয়ই!
আমরা তাকে পাতার পোষাকে দেখবো, তাতে হাত রাখলেই দীর্ঘ পাখিরা
সারি সারি উড়ে যাবে আকাশে, তাদের ডানার শব্দে শাদা শাদা কাশবনের হাওয়া
সবুজ তরঙ্গে ভেসে থাকবে, তার গভীরে জগতের ক্রন্দন
আরো গভীর রাতের বেলা কেউ ঘুমিয়ে গেলে আমরা তাকে জাগিয়ে তুলবো।
আমরা পাতার শিরায় সময়ের তাঁবু ঘরে যূথবদ্ধ হয়ে,
পাখিদের
সংসারে জেগে থাকবো, বিষন্ন পযর্টকেরা জেগে উঠবে
বালি ও কাঁকড়ায়।

আমি তারকাঁটায় দেখছি

আমি তারকাঁটায় দেখছি রোদ্দুর জড়ানো নদীর পাড়,
দেওয়ালটা ঘুরে উঠেছে যেখানে তার ঘুটঘুটে তীরের ফলার নিচে
দেহঘুম থেকে জেগে ওঠা পাখিরা লিখতে বসেছে
মেঝেতে।

কালচে রাতে কাঠের গায়ে লেপটানো সুগন্ধিরা উড়ে যায়

বিষণœ প্রহরীর স্থির চোখে গেঁথে রাখা গভীর
সুর, চেনা শরীরের নদে অচেনা বৈঠার শব্দ তুলে
ফিরে যায় জলের নৈঃশব্দ্যে।

আমি সবুজ করোটি খুবলে খুবলে গর্ত করছি,
তার মধ্যে মদ ঢালছি, বরফ ঢালছি, লেবু চিপে দিচ্ছি,
যাবতীয় প্রণয়তিলের পিঠের ওপোর
চাকুর ওষ্ঠরা গলে গলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেখছি সীমানা ভাঙা সেমিজের ছায়ায় জেগে ওঠা
নির্জন মুখমণ্ডল, ওখানে ভাসছে সোনাভান,
হাট শেষে বিকেল বেলার ঘরে ফেরা পায়ের শব্দরা
বহুদূরের জানালায় দাগ রেখে এসেছে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকানো মুখেরা সীমানা মুছে
চলে গেছে, তাদের মুখের আরশিতে আমি সূর্য ওঠা লাল
দেখি,

সুপ্রহর সুপ্ত নৈর্ঋতের গভীরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি দেখি
বেড়ার ফাঁকের একঝাঁক মুখ, উলটানো আলতার শিশি।

দৃশ্যবাদী কাঠুরে

দৃশ্যবাদী কাঠুরে ও তার গোপন রান্না ঘরের
পাশে, আমি দেখি জানালায় ভালুকের ছবি, অর্ধেক নারী
অর্ধেক পুরুষেরা বৃক্ষের ছালের মধ্যে
চোখ ডুবিয়ে দেখছে পোকাদের
সুচুম্বন।

সুদূরে তার ছায়ার শীতে জড়োসড়ো কালো হরিণের ছাপ
যার কোলে মুখোশের দর্পচূর্ণ দেয়াল, নির্জন গ্রীবায়,
জঙ্ঘায় জাগিয়ে রাখে সুষমার সিঁথি।

ঘুম ভাঙিয়ে
মোমের নাভিতে জ্বালিয়ে দেয় তৃষ্ণার নৈশলিপি।

সুদৃশ্যের তাঁবু ঘরে
বাঘিনীর গর্জন ও মুণ্ডবিহীন রাজকুমারের ধড় বেয়ে
যেসব সরীসৃপ নৃত্য করছে,
তাদেরকে দেখছেন নির্লিপ্ত ফটোগ্রাফার।

আমি নীল যাদুঘরে একখানা পায়ের ছাপ দেখি,
মটরশুটির শুকনো পাতার শব্দে
মচমচ করে ওঠে শহরের অলিগলি।

দূরে ভেঙে পড়ে একটি ব্রিজ।

হাড়ের কম্পনে তৈরি একটা ছবি ঘরের দেয়ালে
জড়াজড়ি করে কিছু চুড়ির শব্দ।

কালো ঘোড়া

অবিশ্বাসীদের মশলা বনে স্নায়বিক ঊনুনে
মাংশ রান্নার উৎসবে কারো কোন ভণিতা নাই শঠতা নাই।

দূরে কাছিমের পিঠে নদী হাওয়ার স্পর্শে

সাধারণ মানুষেরা জীবনের চর খুবলে তুলে আনছে
বিশ্বাসের গুচ্ছ-গুচ্ছ চারা।
তাদের পাতায় পানি পড়লে বুকের মধ্যকার শব্দ
পাখি হয়, সন্ধ্যা বেলা নারীদের হাতের চুড়িতে
খুট করে শব্দ হয়।

আমরা মশলা বনে সচকিত হয়ে উঠি, মুঠিবদ্ধ
হাতের ভেতর, বাইস্কোপে, দেখি ফেরারীরা ক্ষুধার্ত বাঘিনীদের
মুখে জল এগিয়ে দিচ্ছে, পানের বরজ থেকে
লালন ফকিরের
গানের সাথে ভেসে আসছে মাঝিদের বৈঠাশব্দ।
আমাদের তৃষ্ণার ঘড়া ভেঙে সবুজালো গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।
সবুজালো মাটিতে অতিথিরা একে একে হৃৎপিণ্ড খুলে
ময়না দ্বীপে গড়ে তুলছে ছোট ছোট
শোভনের গোলা।

আমরাও কাছাকাছি খুলে রাখি হিংসার সড়ক বিভাগ,
লোভের বিষণœ যাদুঘর। শুধু ইচ্ছের পায়রাগুলো যতœ করে
তুলে রাখি কাঁধের উপর।
রান্না শেষে ভোজসভায় আগত সব মুখের চাহনীতে জ্বলে ওঠে
ঘুঘুডোরার হার, হর্ষস্নানে ভিজে ওঠে মাঠ।

ভেজা গন্ধের কলসের গায়ে জোনাকিদের ভিড় ঠেলে,
আকাশের দিকে উড়ে যায় মশলার ঘ্রাণ, যৌথ চেতনার অবাধ্য
কালোঘোড়া।
উনুনে জ্বলতে থাকে মুখোশের সাপ।

নিশিযাপনের লিপিগুচ্ছ

১.
প্রবাহনের উষ্ণতা উড়ে গেছে যাদুমন্থনের স্কন্ধে
তাকে ফেরাতে সুপ্রসন্ন বৃক্ষান্তরে জ্বলে ওঠো। ওপারে দ্বিধার
আয়নায় ফুটছে শয়নভঙ্গি, বক্ষউন্মূল
কক্ষের সুঘোর নৃত্যে, জাগরণের পেয়ালায় সাজিয়ে রাখো
সুস্থির চোখের সীমানা।
সুনিবিড় চোখাচোখিতে স্পষ্ট হোক দেখার দেওয়াল।
দেখে নাও সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা বোতাম ঘেঁষা আঙুলের ছাপ,
নিঃশ্বাসের শব্দলুপ্ত ঝোপে জাগ্রত ওষ্ঠের পুষ্পঘ্রাণ, প্রক্ষিপ্ত
আলিঙ্গনের নদী যেখানে উপচে ওঠে,
তার পাশে তোমার দৃষ্টির শয্যালগ্ন বাতিঘর খুলে রেখো।
দেখো, আরো নেভানো বাতির দেহে

গভীর সান্নিধ্য ছোঁয়া।
উন্মত্ত নৈঃশব্দ্যের চোয়াল চিরে পতঙ্গডানার ধ্বনিতে
সুদূর প্রান্তের গৃহান্তর ভেসে ওঠে
জানালার কাচে।
আর আধখানা মুখের জ্যোৎস্নায় অগ্নির নম্রশীল বিভ্রমে
দ্বিধার সুড়ঙ্গে স্মিত মোমোজ্জ্বল বিচ্যুতি। এপারে, দ্বন্দ্বের বৈঠায়
ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সিম্ফনিতে ভিজে উঠছে
রোদাচ্ছন্ন ঘাস।

২.
স্তম্ভিত নীলাভ থেকে সরিয়ে রেখেছি হাত ও হাতপাখার রাত।
খড়মের শব্দ তুলে রেখেছি ঘরের পুরনো সিন্দুকে।
এবার কোন এক বৃষ্টির রাতে, ঘর থেকে বের হ'য়ে সোজাসাপটা
তোমার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবো।
সমস্ত পাখিদের পক্ষ থেকে তোমার কাছে একটি আরজি পেশ করবো।
এ শহরে যে সব পাখিরা লেখাজোখা করে, তাদের আবাসস্থলে
তুমি একবার পা রেখো।
আমি মুখ ফেরানো নদীঘাটের পাশে
জেগে থাকা মাঝির দিকে তাকিয়ে থেকে তোমার মুখের
নৈশস্কুলের নিকটে এসে উড়িয়ে দেবো পৃথিবীর সমস্ত হাসপাতাল,
পুলিশ স্টেশন।
ওষুধঘরগুলোতে ভরে উঠবে পাখিতে, আকাশে।

নটরাজ

বেল কাঠের চওড়া নিস্তব্ধ রৌদ্দুরে নির্বাক হয়ে বসে
আছে কালো—কুমারী গাল।
তার নিষিদ্ধ আলিঙ্গন উড়ে যাচ্ছে বলিষ্ঠ পুরুষের চোখে।

আগুনের দাহ ফেটে গড়ে উঠছে স্মিত প্রাচীর।

ভাঙা দেওয়ালে সৌরচুম্বনের নীলঘড়ি
অনাথ উদাসিনীর গোপন পুরুষেরা একে একে ঢুকে পড়ছে
নেভানো লণ্ঠনের সিঁড়ি ঘরে।

বেজে উঠছে সুর, সন্তাপের রাত প্রহরী না ঘুমানো চোখে
একাকী দেখছে বিলবোর্ডে হেসে ওঠা শোক,
বিহ্বলার নতমুখী দৃষ্টিম্লান।

মাটিতে পড়ে থাকা আপেল ও ছুরির স্নায়ুতন্ত্রে
যে স্থিতির কোকেইন গভীর সঙ্গমের
সমুদ্রে ডাকে, তার স্থির ঠোটে ফুটে ওঠে লোবানের ঘ্রাণ।

কামুকেরা ব্রিজ ভেঙে পড়া পিলারে আশ্রয় খোঁজে।

আমি দ্বিধাতুর শহরের নাভিযানে
সহাস্য বৃষ্টিতে, যাত্রীদের মনোজঙ্গলে ভরে উঠতে
দেখি, ভালুক ও বাঘে।

দ্বিধা

সন্ধ্যার মগজ গলে পড়ে রাস্তায়, আমার দ্বিধা
উঠে আসে নীলগ্রীলে, খুব কাছ থেকে সরে যায় বহুভাজে
ঋদ্ধ নির্জনতা, তাকে ফুলের পাপড়িতে পাশ ফেরাতেই

দ্বিধার ভেতর কুল কুল বয়ে যেতে দেখি নদী, খঞ্জনা
দূরে, বুক ভাঙা রাত, চোখের বাইরে

দেওয়ালে কারা কান পেতে শব্দ শোনে?

অনেক পাখি তো না উড়ে বুকের মধ্যে ডানা ঝাপটায়
আমি অভিমান বুঝি না,

বুকের চিনচিন কিছুটা বুঝি

রোদচশমার কাচে আমাকে চে'য়ো না

হাতের কিনারে রান্নাঘরের আলো ছাপিয়ে উঠে আসে
রিনিঝিনি, বেড়ালচোখি মায়ার কাছে

আমি কিছুই চাই না, যে কোন পোকার

মৃত্যু দৃশ্যের চেয়ে তোমার হাতের আঙুল অনেক
বেশি রোদ ঘুঙুর

ভেজা কাঠের স্পন্দিত গন্ধ

ভেজা কাঠের স্পন্দিত গন্ধ ছেড়ে নৌকার বৈঠায়
পুলকিত গভীর রাত্রিরে—জেগে ওঠে মেছো বাঘ
পুষ্পবৃন্তের কাছে মুদ্রিত ঘুম
মুঠো খুলে নিরর্থকভাবে কাছে যেতে চায় লোমওঠা
শয়নভঙ্গির খরগোশ শিশুদের দলপতি
এদের বাসগৃহে আমিও গেছি, থ্যাতলানো দেহে
রোদ মেখে দেখিয়েছি—করোটির জ্বর, বাহুর ভাজ

ভাঙা সবুজ দ্রোহ ও অবিশ্বাসীদের শার্টের কলার
থেকে উড়ে যেতে দেখেছি সাপুড়ে
তাকে কাছে পাই নি, মনে হয় খুব নিকটে
অনেক সাধনার পর যাকে পাওয়া যায়, সেই মঙ্গলরীতির
জলসায় আমি কখনো যাই নি
মাংশপোড়াগন্ধ ও আগুনের হলকা লাগা মানুষের মুখ
আর মুখোশে লেগে থাকা রক্ত, দেয়ালে
মেঘ হয়ে উঠছে
আমরা বোকা ঝিনুকের পেটে পিয়ানো বাজানো
রাতে পুরোহিতগণের পায়ের তলা থেকে
কুমিরের বিশাল হা থেকে দেখি অজস্র কাঠ খোদাইকারীরা
অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়াচ্ছে
তাদের কবজিতে ফুলবাগান, আর রন্ধনশালায় তারা
আবার জড়ো হচ্ছে, আগুনে সৈকত প্রহরে
শোকপূর্ণ সমাধিকক্ষের পাশে হলুদ বনের মধ্যে
নিবিষ্ট বৃক্ষদের মেয়েরা চুল খুলে দিয়ে যে পথ তৈরি করেছে
তাদের চুলের ভেতর সবুজ দেবী
ওখানে মাছের কাঁটায় রাত্রে শীতের কুঁড়েঘরে
রান্নাউৎসবে অতিথিরা কালো পাগড়ি খুলে উড়িয়ে দিচ্ছে
রসনা পক্ষী, প্রণয়উচ্ছ্বাসে কাঠুরে তাঁর
কুঠারে মাটির ঘ্রাণ মিশিয়ে একমনে দেখছে
বনমোরগের ঝুঁটি
নির্বোধ কিছু পতঙ্গপড়শি
বিষাদের চিঠিসমূহ'র বাক্সে শুকনো পাতার শব্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে
আছে যে উঁচু টিলায়, সেখানে বালকেরা নগ্নরোদের
প্রহর খুলে দেখছে পাহাড়ের নীলচূড়া

সিন্দুক

একটি লোহার সিন্দুক; ময়লা ও পুরানা
কিন্তু অভূতপূর্ব, দেখলেই শানশওকতের ছবির ভেতর
উড়ে যায় অনেক মলিন মুখেদের টুকরো টুকরো ছবি।
এই শানশওকতের নিস্তব্ধ ছবি তোমার পিছন দিকে,
হেঁশেল ঘরের কাছে ফেলে রাখলে এমন কিছুই হতো না, তবু,
তাকে বুকে আগলেই রাখি
বহুদিন থেকে একলা একলা, তোমাকে যেমন সারাক্ষণ
বহন করে বেড়াই সেরকমই ওই, ওই কিম্ভূতকিমাকার,
প্রাচীন বস্তুটাকে আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। এই দায়, এই অতি
সতর্কতা, ওইটার জন্য আমি বরাদ্দ রেখে আমার আর সকল
কাজগুলি সম্পন্ন করি।
আমার যে জগত সে জগতে এইটার কোন মূল্য নাই, তবুও,

তাকে বহু বহু যুগের আপন মনে করেই ওটাকে আমি ফেলে দিতে
পারি না, তাকে আত্মীয় ভেবে যেখানেই স্থায়ী হই, সেখানেই
এইটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়।
ভাল-বেসে যতœ করে সাজিয়ে রাখতে হয়। এটা এখন বহন
করতে করতে না থাকলেও খারাপ লাগবে হয়তো, হয়তো বুকের
ভেতরটা হাহাকারের সীমানা ছেড়ে যাবে. .
বাসা বদলালেও সেটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাই,
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, এই সিন্দুক যদিও এখন অব্যবহৃত,
পরিত্যক্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
ভাবি, তারপরও, তার কী দাপট! আমরা তাকে নিয়ে সবসময়
তটস্থ থাকি, সতর্ক থাকি, এই লোহার জগতে, এই পুঁজির দুনিয়ায়
ওই লোহার সিন্দুক, ওই নিস্তব্ধ যাদুকরী ময়লা, পুরানা
সম্পদ এখনো কী রকম এক ডাঁটের সাথে আমাদের
সাথে টিকে আছে।
এইটা যখন ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল আমার দাদা, তখন
বহু গ্রাম গঞ্জ থেকে বহু নারী-পুরুষ
দেখতে এসেছিল।
সে এক দেখার জিনিস ছিল! এখন এর শ্রী তেমন নেই।
জীর্ণ দানব চেহারার এই জিনিসটাকে, এই আত্মীয় কে, এই ঝামেলাপূর্ণ
ভালবাসাকে, আমি অনেকবার ফেলে দিতে চেয়েছি, একবার বিক্রি
করেও দিতে চেয়েছিলাম
ভাংড়ি দরে। আমার স্ত্রীর বাধার কারণে তা
বিফলে গেছে। তাকে রেখে কী ফল, আমার, আমার বংশধরদের?
এটাকে আগলিয়ে রাখার সময় আমার নেই।
আমি অনেক দিন হলো এটার কোন খোঁজ খবর রাখি না।
আগেও যে খুব একটা রেখেছি তা না।
তবু এই শীতে, ঠাণ্ডার গহীনে ঢুকে আজকেন মনে আসছে?
দূর অতীতের দিকে
আমি মনকে, আমার ভাব সম্পদকে, নিয়ে যেতে চাই না।
তারপরও মনে আসছে! আহা! লোহার সিন্দুক!
মনে আসছে বৃষ্টির ভেতর আমার দাদা ভিজতে ভিজতে
সিন্দুকটা, কোলে করে, শিশুকে যেমন করে মা, তেমনিভাবে আদরে
ঘরে তুলেছিল, এইটাকে সে সন্তানতুল্য মনে
করে সবসময় আগলিয়ে
রাখতো।
আমি আমার জীবন বীণে, কাঁটাতারে, লোভ-লালসায়
এই সিন্দুকের প্রয়োজনীয়তা
অনুভব করি না। এই ডিজিটাল যুগে, পণ্য ও বেসাতির কালে
ঘুম থেকে জেগে উঠে যেই মাহেন্দ্রক্ষণে, এই সিন্দুকের
কথা ভাবি, মনের গহীনে খচখচ করে ওঠে,
তার নিকট অতীতেও আমি তো গ্রন্থিত মেঘদল
আর কাঁটা-গুল্মে পরিপূর্ণ শয্যায়

তোমার বক্ষ উন্মোচিত করে, যেই বৃষ্টির রাত, যেই কোলে
তুলে ঘরে তুলে রাখা শিশুর আহ্লাদ
দেখেছিলাম, ওখানে অনেকগুলো ধনসম্পদ রাখার তাক,
ছককাটা হরেকরকম ঘরও আমি দেখেছিলাম
নাকি দেখি নাই?
সেই তাকগুলো, সেই ঘরগুলো কি এই সিন্দুকের মধ্যেও আছে?
আমি এখন, এই লোহা পিরিতের জগতে
সিন্দুকের ভেতর বাহির
খুলে দেখার চেষ্টা করছি, যেটাকে এতদিন অবহেলা করে
অনুভব করি নি, সেটাকে
এখন, এইক্ষণে, ডালিমের ন্যায় লাগছে, ঘুমের মধ্যে
ছুঁয়ে ছেনে দেখছি কাড়িকাড়ি টাকা-কড়ি,
দূর অতীতের গহনাগুলো ঝুমঝুম বেজে উঠছে শয়নকক্ষের তাকে।

পথভোলা

সবুজ নেশার পথভোলা আলো সিংহ
মেঘের ধ্বনিতে ঘরছাড়া
মহুয়ার উন্মুক্ত জগতে, খড়ের গাদায়, একা।

চারিদিকে খোলা, যেইদিকে নদী পথ সেইদিকে
মুখ করে গাঢ় এক আকাঙ্ক্ষায়
মানুষ দেখবে বলে ঠাই বসে থাকে।

মানুষেরা আসে না, ঘাট ছেড়ে উঠে আসে ডাঙায়
একে একে হরেকরকম ভালুকেরা
তাদের মুখে মানুষের গন্ধ, মাংশের কণা।

এইসব দেখে আর দূরতম দিগন্তে অসম্ভব মেঘের
পিঠে উড়ে যায়, আর নাঙ্গাভুখা
আকাঙ্ক্ষার সর্বস্ব খুলে রক্তবর্ণ তৃষ্ণার
সিংহিনীর খোঁজ করে।

সিংহিনীরা লুকিয়ে আছে মানুষের গায়ের গন্ধে, মাংশের
কণায়, পথভোলা তাই বসে থাকে,
যেইদিকে দৃষ্টির বক্ষ খোলা দুয়ার
সেইদিকে মুখ করে।

তোমার মুখের স্বদেশী পক্ষীকুল আর মেঘের ডাকে
আমাদের প্রচলিত বিধি-নিষেধের তীর ছেড়ে
ঝোপের গভীর মুখশ্রীতে—পথভোলা ঘুমিয়ে রয়েছে।

রান্নার প্রস্তুতি

নীল চাবুকের অবুঝ ও অন্ধ মেয়েরা আয়নায় সন্ধ্যামালতী, আমি ক্রসচিহ্নে
যাদের মুখ ভেসে যেতে দেখি, তারা সুগন্ধী প্রহরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে
ফিরে যায় ঘরে।
শববাহকের দল দেয়ালের ভেতর ঢুকে গেলে বাদ্যযন্ত্রীরা পানশালায় উড়াতে
থাকে মুখরতার নাভীবন। আমি গৃহত্যাগী সবুজ খরগোশগুলোকে
মৃত-নদের ক্রন্দন শোনাই।
আর যে চিল পুরুষেরা জ্যোৎস্নায় উড়ে উড়ে এখন অবসরে,
বাঘের ছালে নিঃশব্দে ঘুমায়; আমি তাদের ঋদ্ধ হাড়-মাংশ গভীর রাতে
একাকী কষাই।
চারিদিক হয়ে ওঠে শুনশান, নিশ্চুপে আমার ঘরে জমা হয় শত শত গিরগিটি,
যোগিনী পাড়ার কেউ কেউ উঁকি দিয়ে ফিরে যায়, আমি রোল কলের খাতায়
লিখে রাখি সব।
আওলানো ভাঙা চোয়ালের গিরগিটিদের বাড়ির পাশেই, আমি স্কুলব্যাগ খুলে
করোটির রুলপেন্সিলে গেঁথে তুলি ঘোৎঘোৎ করা পূর্বজদের হাড়,
বাদামি-স্লেটের আকাশে উড়িয়ে দিই ক্ষুধার্ত বেড়ালের
কালো নখর।
ডোবার ভিটেতে দাঁড়ানো নিমগাছের নিচে, যারা কালোদেহ, তাদের মাথানিচু
ছায়ায় গড়ে উঠেছে যেই রন্ধনশালা, সেইখানে, কচি খরগোশগুলো আমি
টুকরো টুকরো করে, মাংশ রান্নার প্রস্তুতি নিই।

গুপ্তচর

কাঙাল বালকেরা চিরদিনই অন্যের দুয়ারে
হাত পেতে বড় হয়, ঘাসের ভেতর, ঝোপের ভেতর,
যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে
ছুটে চলে, মনের জংলা-কাদায় বেড়ে ওঠে
আশা-নিরাশার বুনোফুল,
জুঁই-টগরের গা থেকে রোদ ছিটকে পড়া ক্ষণে কখনো কখনো
এরা গান গেয়ে ওঠে।

চাবি সারাইকারীরা এসব বালকদেরকে দুয়ার খুলে রাখা
রাজকুমারীর গল্প শেখায়।

আমি এইসব বালকদের যূথবন্ধনী খুলে হরিৎ
বনে ছেড়ে দিয়ে আসি, বনজ প্রহরের খুলিতে, গ্রীবায়,
জংঘায় ভাষাহীন এক মায়ার জগতে
এরা বেড়ে উঠতে থাকে, ছুটোছুটি করতে থাকে।

চোখাচোখির বাইরে কীরকম এক আলুথালু ভাব, উড়–উড়– মন

পাখির সাথে, গাছের সাথে, হরিণের চোখে,
ঘাসে ও পাতায় উড়ে উড়ে যায়, ঘুরে ঘুরে আসে।

রাত্রি-দিন বলে কিছু নাই, শুধু মিলনের কাক্সক্ষা,
উড়ে উড়ে ভুবন দেখার স্বাদ,
আর পাখনার শব্দে জেগে জেগে পাখনার রঙে বিভোর হয়ে
আকাশে, বন-সবুজে মিশে যাওয়া
আমি জেনে গেছি - হাড়ের ভেতর সমুদ্র ঢেউয়ে
কে তোমার সাগ্রহের পর্যটক, কার কার মুখের বালুভূমিতে
কাঁকড়া ও কাছিমের বসতি।

সমুদ্র ছায়ায় থিতু হয়ে মুক্তা আহরণকারী
গুপ্তচরের নাম বিষাদ। তার বাড়ির পাশে কাঙাল বালকেরা
ছলনাময়ী—
কুলশীল বংশের ঘাতকদের ওঁৎ পেতে থাকা
ছুরিতে প্রত্যহ ঘুম থেকে জেগে উঠে
দেখে অসংখ্য দুয়ারে গুপ্তচরের নাম ফুটে আছে।

ক্যামেরা

(১)

দৃষ্টির আড়ালে শিহরিত পুষ্পবাণ—
উড়ে চলা অসংখ্য পাখিদের পাখার শব্দ মাথার ভেতর শব্দসমুদ্র, নীলিমার কাঁটাতার আর
তৃণভোজীদের ঘাড় থেকে মায়াবী নর্তকীদের মেঘে
উড়ে যাবো। ঝুমঝুম বাজবে হাড়ের স্বপ্ন।
কাল কেউটের মাথায় গভীর মগ্নতায় যেইসব ঋষি-বালকেরা অলীক উলুবনে, শাদার ভেতর
কালো-ডোরা ছকে—পুঁতে রাখে চাঁদ ও কামুকে উল্লাস, সেইখানে, রাধা চুলের বিছানো
ঘাসের নিচে
নৈরাজ্য দেখবো, ফুটফুটে ঘড়িদের বাচ্চারা দূরে দাঁড়িয়ে—
দেখবে কামরাঙা গাছের তলে দুইজোড়া পা।
উদ্দেশ্যহীন বিছানার পৃষ্ঠায় জ্বলে উঠবে সু-পরীদের মন, সূর্যাস্তের দেওয়াল।

(২)

ওপারে মুগ্ধ হয়ে বুদ হয়ে মায়ার দংশন দেখবো, বুক ভেঙে যাওয়া মানুষেরা হাহাকার করবে,
বৃষ্টির শব্দ শুনবে মাংসাশী প্রেমিকারা, তাদের জিভে -
ভিজে উঠবে, বিড়ালিনীর রান্নাঘর থেকে যেই শব্দ ভেসে আসবে, সেই শব্দ,
খুন হয়ে যাবে জানালার পাশে।
দুদিকে মুখ করে পড়ে থাকবে দুদিকের ভাঙা-নদী, উজাড় হয়ে যাওয়া মধুবন থেকে ভেসে
আসবে হাসি, পেতনিদের চুল পড়ে থাকবে শুধু, বর্ষাগ্রন্থ খুলে যে নারীরা মেঘপুঞ্জের
ধ্বনিতে রাত জেগে রয়, তাদের কাক্সিক্ষত পুরুষেরা

ফেরে না গৃহান্তরে।
বর্শার পাশে পড়ে থাকে ভাঙাচুড়ি, শস্যকুমারীর আলতা রাঙানো পায়ে রাত্রি নামে,
ভেবে দেখছি, নিখুঁত হাহাকারে ভেসে উঠছে
মধুপ ও নিপুণ মনের ফাটল।
জগত সংসারের আয়না ও বিছানার তল থেকে উড়ে যাচ্ছে তীর
ক্যামেরা শুধু ছবি তুলে রাখছে।

আলো সম্ভাবনা

ঘাই মেরে ওঠে রাতে খুব নিবিড় দেহভঙ্গির বাঁক
চেনা নয়, অজ্ঞাত, অন্য কেউ, গভীর পদধ্বনি
উড়ে যায় মেঘে মেঘে

না চেনা মুখের রঙে ভাসে
নিজেরই আলোসম্ভাবনার ঘের, কৈ লাফিয়ে ওঠে
তার কানকোতে
স্তব্ধতার গুহাতে—অজ্ঞানতার সাপ, বুনোজন্তুদের
ভিড় ঠেলে—
মন ওইখানে যেতে চায়—তীব্রতীরের শৃঙ্গারে
সেই নেশাপুরের বাগান ঘেরা মোমঘরে

একা
একা উঠে আসে সেইঘরে পূর্বমেঘেদের দেখা চোখ,
কাতরতা, অন্য হয়ে ওঠা,
যেইরুপ তোমার উজ্জ্বল মাংশের কড়াই, ঘ্রাণ ভেসে
থাকে, থাকে আরো বুনো চঞ্চল সর্প ফণা—বাঁকানো দেহ
সেইখানে অমৃত ভাণ্ড ভেঙে গড়ায়ে নাকি যায়!

তার পাশে যারা জাগে
তাদের সংরাগে, সন্তাপের ঝোপঝাড়ে, চায় যেতে
বসন্ত, হেমন্ত, শীত নাই, সদাই জুঁইফুল হাওয়া বয়
আনন্দ রেণুর উচ্ছ্বাসে চারিদিকে শিউলি
আর ঘুমন্ত গ্রাম একই সহদর, পিঠাপিঠি

তবু যারা কুপির আলোয় গ্রন্থকীট, খুবলে খুবলে দেখে
মাটি, গন্ধ শুকে শুকে চিনতে চায়
বাগানের ফুল, পাপিয়া, ওই প্রাচীর ভাঙার পর,
উড়ন্ত পাখিরা চিনে নেয়
বাসগৃহ তোমার

ওখানে পথভুলে,

গোলমেলে ও জেব্রার দাগ ছেড়ে যেতে চায় পবন বান্ধব
নৌকার মাঝিরা ওইখানে হাহাকার
আর নীল বেলুনের সাথে ওড়ে, ট্রাকের শব্দ তুবড়ানো গালের
মাংশে সেটে রয়, রাতে ঝুমুরে ওড়না ওড়ে
এই সাজানো গোছানো
ছকের বাইরে ছিটকে যাওয়া আলুথালু পথহারা
আলোগান গাইতে গাইতে ঢুকে যাবে
অন্ধকার আর পিপাসার ব্যঞ্জনায়
ফুটে থাকবে নাইট স্কুল, মোমঘর
নাচ ও নাচমুদ্রার বাঘ
সিংহদ্বারের প্রহরী হার্ট খুলে ঘুমিয়ে থাকবে
বাগানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ের ছাপগুলো হয়ে উঠবে ময়ূরপেখম
তুমি মাটির ময়নাটারে দেখে রেখো,
উৎখাত হয়ে যাওয়া
পথহারা—ঘর থেকে, স্তন থেকে
কিছুই নেইনি, মধুপের দলে মিশে গেছে তার ছায়া শিকারি আঙুল
আর
গভীর রাতের চাকে ও চুম্বনে
হারানো মানুষেরা, বনভোজনের নৃত্যশীল মেঘেরা
তার
পিছন তাকের কালিঝুলিতে ঝুলে থাকুক
সুরের ভেতর ডুবে গিয়ে, কাঁটাগুল্মের দেশে ভ্রমণ শেষে
আবার ভেসে উঠবে যেই বর্শা, যেই ঘুণপোকা
তাদের গ্রন্থিতে,
গূঢ় আকাঙ্ক্ষার কাচে ঢুকে, বাসনার পেটে চাকু বসিয়ে সাগ্রহে
দেখে নেবে পিঠের ওপোর গাঁট হয়ে বসে থাকা
যাদুকরের আঙুর থোকা
ও ভ্রমণ পথের হলুদযাত্রীদের
পিছন ফেরানো পা আর অপরিশীলার কোমর ধরে
যারা বীর্যপাতে ভরে তুলছে শহর, তাদের হাড়ের ভূগর্ভে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে দিবে ভ্রাতৃসঙ্গ, পাতাল কুমারীর চুল

ওখানেই মন যেতে চায়, চায় আরো ওখানে বাসনা
ফুটুক, ফেটে যাক রমণের অজ্ঞাত ফল. . .

শাপগ্রস্ত বেণীর আকাশে

শাপগ্রস্ত বেণীর আকাশে কামাক্ষীর হলদে পাখিরা
বিষাদের গ্রন্থি থেকে উড়ে যাবে—
ফুলশয্যায় পড়ে থাকবে মেঘপুঞ্জ। চূর্ণ কাচে ভরে উঠবে শহর।

সন্ধ্যার প্রণয়শীল বেড়ালেরা দেয়াল টপকিয়ে তোমার ঘরে
এসে দাঁড়াবে, সুতীব্র শীতের বেহালা
বেজে বেজে থেমে যাবে।

বাদ্যযন্ত্রী তার আঙুলের শিহরিত
অগ্নিগুচ্ছ থেকে আনুগত্য সরিয়ে নিলেই, আমি আর
চূর্ণকাচ থেকে উগরানো আলো —
শূন্যতার শাস্ত্র প্রণেতাদের দলে ঠিকই ভিড়ে যাবো।

শববাহকেরা
একে একে চলে যাবে সুশৃঙ্খল, শ্মশান ঘাটের তরঙ্গক্ষুব্ধ
বাতাস আর আমি তোমার ঘরে
ফিরে আসবো।

শহর উঠবে ভরে কাচে চূর্ণ ঘাসে। মেঘে।

প্রতিটি ভোরের সূর্যে

প্রতিটি ভোরের সূর্যে তন্দ্রাহীন জানালায়
লটকিয়ে রাখো দীর্ঘ চুম্বনের স্বাদ। অমৃত ওই চুম্বন সম্ভারে, সৌদামিনীর
প্রগাঢ় স্রোতে যেন ভেসে যায় বিষাদ মুখর নগরের ঝাঁক।
পানকৌড়ির রক্তলেগে থাকা রুমালে
তোমার অধীর, প্রকম্পিত স্পর্শ ছড়িয়ে দিয়ে, ফিরে যায় সময়হীন পালের -
শিরাসূর্যের বাঁকে।
মোহনার ক্ষুব্ধ তরঙ্গ সিম্ফনির রেশমি নাওয়ে—সঙ্গম শেষের রক্তিম সৌরভ
উথলিয়ে ওঠে, গভীর তন্ময়তায় নৈর্ব্যক্ত আঁধারে নোঙর ফেলে
প্রতিক্ষণে ছিন্ন হও তুমি।
বিদ্যুৎ চমকের মতো আবারও বিপুলশূন্যতার প্রশস্ত রাস্তার পাশে ফুটে
ওঠো—অতৃপ্ত তৃষ্ণার গাল।
রৌদ্রসমুজ্জ্বল উরুসুরঙ্গের নদে বানের তোড় এসে ভাসিয়ে নেয় ফের,
নিঃসঙ্গ দাঁড়ের বাহু ভেদ করে ছলাৎ ছলাৎ
হৃৎকম্পন ঢেউ তুলে যায়. . .
দীপ্ত নখরে নীলতারাদের সমুদ্র সৈকত পার হয়ে ভুলে যাওয়া দ্বীপের মত
একা, শুধুই দাঁড়িয়ে থাকি।
অঝোরে বৃষ্টির শব্দে সবুজ গাছের পাতাদের ফাঁকে মেঘ এসে
খুলে ফেলে নিঃসঙ্গ নেকাব। তুমিও নিঃশব্দে গভীর রাতের একাকিত্বে
বিষাদ মৈথুনের সঙ্গীত মূর্ছনায়,
নিস্তব্ধ রাতের টোলপড়া নীলে—চু'য়ে পড়ো লাল,
কুয়াশা জড়ানো ভোর, কাঠচেরাইয়ের মৌনতা ভাঙার গোপন শৃঙ্খল।

এখন যেমন

এখন যেমন জেগে আছি চেয়ারে পিঠ দিয়ে

কাল সূর্য উঠবে তখন চেয়ারের এদৃশ্য তলিয়ে
যাবে ময়ূর পাখা তোমার চোখ থেকে
ঘড়ির গলন্ত দেহের ওপোর এখন যেমন

তেমনি জেগে উঠবে হাতল ধরা যন্ত্রণা

যেখানে রাধাচূড়া নেই শীতল রাতের নৌকায়
ভেসে যাবে পিঠের রোদ পোহানো সর্ষেক্ষেত

এখন যেমন তার কোন চিহ্ন নেই

ক্যালেন্ডার

একটা দরোজার অর্ধেক অন্ধকার।
অর্ধেকে কাঠের আকাশ মেরুন রঙের তারার মধ্যে ছয়খানা ফুল
পাতা, সেলাইয়ের
দৃশ্য ভেঙে ফটোগ্রাফার
কচুপাতার ফোটা ফোটা পানি, বিকেল বেলার পাগলা গারোদ
মনোরোগির আঙুলে
এক চিমটি রোদ
ছাপ দিয়ে চুপিচুপি বেজে ওঠে কথার সেতারে। স্তব্ধতার
ফোলা ফোলা ঠোটে বাঁক নিচ্ছে ক্রসিং
ভলবো বাস থেকে নেমে যাচ্ছেন লিপিস্টিক তাকে ঘুঙুরে
মানিয়েছে, দড়ি খুলে
দেখি
মনের গভীরতায় খুট করে শব্দ হয়, পাশের পেপার ওয়েটে
পানির ভেতর লালফুল
অন্ধকার ফুঁড়ে দরোজায় হেলান
দিয়ে
ওড়না পেঁচানো একটা মুখ, হাসির অস্পষ্ট রেখা, দুচোখে
নির্জনতার অনেক পাখি
কানের দুলে চুয়ে পড়ছে রাত্রি, নীরবতা

ক্যালেন্ডারে তারিখ উড়ছে, কাঠের আকাশে একটি বিমান

ধূপ

ভাষার বাইরে কিছু নাই? তাকালেই তো বুঝি বৃষ্টির দিন
মেঘপুঞ্জ চোখের পাতায় সাজিয়ে তোলে হলুদ ফুল
তার গন্ধ চিল
ওড়ে ঠোঁটের নিচে চামড়ার মধ্যে ঢেউ ঠেলে
নেয় মাটি ভেঙে পড়ে চাকা চাকা ফোঁটা
ফোঁটা
পানি পড়ে না বলা না বোঝা কথার
গাছে ফোটে আয়না ও চোখ যার
চুলের ফিতায় গাঁথা থাকে পাখি
শিহরণের
নদী উথলে ভিজে
ওঠে মেঝের
চশমা
দেখা যায় ভাষার বাইরে থুতনিতে থুতনি লাগলে ঠোঁট
এগিয়ে ঠোঁটকে বাসা বাঁধতে দেয় হাতের মধ্যে লাল
সন্দেহ গর্ত খুঁড়ে তুলে আনে বাজিকরের চোখ
জানালা থেকে সরে যায় সাপের ফণা
না তাকালেও শিরশির শব্দ
দিয়াশলাইয়ে গান
গেয়ে ওঠে
ধূপ
গন্ধের এজন্য কোন ভাষা নেই চুম্বনেরও. . .